শিক্ষকদেরও শিখতে হয়

কিভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করতে হয়, শিক্ষার্থীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে জড়তাহীনভাবে পাঠদান করতে হয় এমন নানা বিষয়ে হাতে-কলমে শিখতে পারেন। আর সব মিলিয়ে সুশিক্ষক তৈরি করে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মাসিদ রণ ▷

একসময় ছিল গুরুমুখী বিদ্যা, যেখানে গুরু হাতে-কলমে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এরপর এলো লেকচার সিস্টেম। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নিজেই পুরো বিষয় আলোচনা করবেন, আর শিক্ষার্থীরা শুধু তা গলাধঃকরণ করবে। কিন্তু এখন উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও চালু হয়েছে পার্টিসিপেটরি মেথড বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শুধু তা-ই নয়, মুখস্থবিদ্যার ওপর ভর করে যাতে শিক্ষার্থীরা পার পেতে না পারে, যাতে তারা নিজের ভেতরের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে পারে এ জন্য চালু হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনিং।

এখন কথা হলো, কোনো কিছু কারো ওপর হঠাৎ চাপিয়ে দিলেই তো আর তা থেকে ভালো কিছু পাওয়ার সুযোগ নেই। সহজ করে বলতে গেলে আমাদের দেশে বহু বছর ধরে প্রচলিত যে জগ-গ্লাস পদ্ধতি বা শিক্ষক ঢেলে দেবে আর ছাত্র খাবে—বিষয়টি কিভাবে দমিয়ে নতুন একটি পদ্ধতিকে গ্রহণ করা যাবে?

এই বড়সড় রকমের প্রশ্নটির একটি সংক্ষেপ উত্তর হতে পারে 'টিচার্স ট্রেনিং কলেজ'। কারণ দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পেশাজীবীকরণের জন্য প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের ছোট-বড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর বিএড, এমএড বা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকার আওতাধীন চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সে একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়।

যেমন—১. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ক্লাস নেওয়া হয় পার্টিসিপেটরি মেথডে, যার মূল কথাই হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পর সংযোগ। এতে আমাদের দেশে প্রচলিত বহু বছরের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মাত্রাও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কেননা আগে শিক্ষক তাঁর গুরুগম্ভীর বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠ বুঝিয়ে শ্রেণি ত্যাগ করতেন। এতে শিক্ষার্থী পাঠ কতটা বুঝতে পারল তা জানার কোনো সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া শিক্ষার্থী তার সমস্যাও শেয়ার করতে পারত না। আর এখন ছাত্ররাই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষকের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে।

২. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে নিয়মিত কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অনার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা, যাঁরা পরবর্তী সময়ে শিক্ষক হবেন অথবা যেসব শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাঁরা কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজের সুবিধা সম্পর্কে অবগত থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীদের আরো কাছাকাছি পৌঁছে যান। কারণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যে বয়স, তাতে তারা নানা ধরনের খেলাধুলা, সৃজনশীল কার্যক্রম; যেমন—নাচ, গান, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, লেখালেখি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকতে ভালোবাসে। ফলে যে শিক্ষক এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন তাঁরাই ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষকে পরিণত হন।

৩. বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনার্স-মাস্টার্স করে শিক্ষক হন তাঁরা কিন্তু আগে কখনোই শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসতে পারেন না। কিন্তু টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কারিকুলাম অনুযায়ী তিন মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ করেন বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে। এতে এখানকার শিক্ষার্থীরা কিভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করতে হয়, শিক্ষার্থীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে জড়তাহীনভাবে পাঠদান করতে হয় এমন নানা বিষয়ে হাতে-কলমে শিখতে পারেন। ফলে পেশাজীবনের আগে থেকেই তাঁরা শিক্ষকতা পেশার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

৪. টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কারিকুলামের আওতায় এডুকেশনাল প্ল্যান করতে শেখেন, যা একজন শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এডুকেশনাল প্ল্যান ছাড়া কোনো শিক্ষক তাঁর সিলেবাস বা দায়িত্ব সঠিক সময়ে শেষ করতে পারবেন না। এডুকেশনাল প্ল্যান হলো, আমি কোন শ্রেণিতে পড়াব, তাদের বয়স কত, তাদের জানা বা বোঝার পরিধি কতটুকু, কী কী বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হবে, কিভাবে পড়ালে শিক্ষার্থী সহজেই পাঠ আত্মস্থ করতে পারবে—এসব বিষয়ের পূর্ব প্রস্তুতি।

শিক্ষার্থীর জ্ঞানের চাহিদা সময়মতো পূরণ না করলে ওই শিক্ষকের এই ব্যর্থতা ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে।

৫. যুগের চাহিদা মাথায় রেখে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা, প্রজেক্টরের ব্যবহার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীজোড়া জ্ঞানের মহাসমুদ্রে প্রবেশ করার বিষয়গুলো শেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ আরো আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন ও প্রায়োগিক মনে হয়। যেমন, মানুষের শরীরের ব্লাড সার্কুলেশন বিষয়ে পড়ানোর সময় যদি আমরা শুধু একটা চার্ট বা চিত্র দিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝাই, তাহলে তারা হয়তো বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারবে। কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে যদি ব্লাড সার্কুলেশনের কোনো ভিডিও দেখানো হয়, তাহলে পুরো বিষয়টা বুঝতে শিক্ষার্থীদের একটুও বেগ পেতে হবে না। ফলে শেখানো কার্যক্রম সফল হয়।

৬. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সব সময় শিক্ষা উপকরণের ওপর জোর দেন। কেননা উপকরণ ছাড়া বর্তমানে শিক্ষাদান করা প্রায়ই অসম্ভব। যেমন, ফুলের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনার সময় যদি গাছ থেকে একটি ফুল এনে উপকরণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তারা পুরো বিষয়টা চোখের সামনে দেখে মনে রাখতে পারবে। ফলে পাঠ সব রকম শিক্ষার্থীর জন্যই সফল হবে।

একটা ধারণা আছে যে উপকরণ মানেই হলো ব্যয়বহুল। কিন্তু এখানে জানানো ও বোঝানো হয় কিভাবে [illegible] বা স্বল্প খরচে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যায়। যেমন, প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার করা, হাতে তৈরি করে উপকরণের ব্যবহার বা স্বল্প মূল্যে নানা ধরনের কাঁচামাল কিনে উপকরণ প্রস্তুত করা। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে।

৭. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আরো একটি যুগোপযোগী বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তা হলো, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ফলো করা ও তা তৈরি করা। ফলে এখানকার কোনো শিক্ষার্থী যখন কোনো স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তখন তিনি সহজেই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা, উত্তর তৈরি ও খাতা মূল্যায়ন করতে পারেন। এই প্রশিক্ষণের অভাবে অনেকে শিক্ষক হওয়ার পর কোনটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, কোনটি অনুধাবনমূলক আর কোনটি প্রয়োগমূলক, তা বুঝতেই দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এর ফলাফল হলো ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার দূরত্ব।

এগুলো ছাড়াও টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পড়ানো বিষয়গুলো যেমন—বাংলাদেশ শিক্ষা, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা উন্নয়ন ও শিখন শেখানো কার্যক্রমসহ প্রতিটি বিষয়ের লক্ষ্য হলো সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে সফলভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও পাঠদানে সফলতা অর্জন।

কেমন শিক্ষক চাই

শিক্ষক মানেই গুরুগম্ভীর মানুষ। এই ধারণা এখন পাল্টে গেছে। এখন শিক্ষক হওয়া চাই অন্য রকম। বন্ধুর মতো, তবে বন্ধু নয়।

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নাহিদা আফরোজ লুবার কাছে প্রিয় মানুষই হচ্ছেন ওদের ফর্ম মাস্টার। ফর্ম মাস্টারের সঙ্গে পরিচয়ের দিনটাও ওর মনে গেঁথে আছে। তাঁর পড়ানোর ধরন, আচরণ মুগ্ধ করেছে লুবাকে। তাঁর বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ খুবই সুন্দর। আর কাউকে কখনো বকাঝকা করেন না। সবাইকে বুঝিয়ে বলেন।

ওদিকে মিরপুরের একটি নামি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে কাফি। ষষ্ঠ শ্রেণিটা ছিল ওর জন্য ভয়াবহ। যেমন শিক্ষক ও কল্পনা করেছিল; ক্লাস করার সময় দেখল বেশির ভাগ শিক্ষকের আচরণ অন্য রকম। এক শিক্ষকের কথা ও না বলে পারল না। ক্লাস টিচার। বাংলা পড়ান। পড়া না পারলে মারধর করেন। স্কেল দিয়ে মারেন। কান টানেন। শুধু তা-ই নয়, পরীক্ষায় নম্বরও কম দেন। অথচ ওর যে সহপাঠীরা ওই শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে তাদের বেলায় ওই শিক্ষকের আচরণ একেবারেই উল্টো। ব্যতিক্রম শিক্ষকও আছেন। ওদের গণিত শিক্ষক। কেউ যদি বুঝতে না পারে, তিনি বুঝিয়ে দেন। সবার হোমওয়ার্ক চেক করেন। তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়তে চেয়েছিল কয়েকজন। তিনি হাসতে হাসতেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি তো ক্লাসেই সব বুঝিয়ে দিই। আবার প্রাইভেট কেন? আমি প্রাইভেট পড়াই না।'